রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-ভাবনা ও ব্যাকরণ চর্চা

মাহবুবুল হক*

উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ মূলত ছিল প্রথাগত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে বাংলা ভাষার স্বকীয় শৃঙ্খলা আবিষ্কারের পরিবর্তে এ ধরনের ব্যাকরণ রচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাতে আরোপ করেছিলেন প্রচুর সংস্কৃত সূত্র, তাকে দিয়েছিলেন আনুশাসনিক রূপ। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষা এবং এর ব্যাকরণ-কাঠামো যে সংস্কৃত থেকে আলাদা তা এ সব সংস্কৃত পণ্ডিত মানতে পারেন নি। এ ধরনের প্রচুর ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। কিন্তু এগুলোকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। এগুলো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল নেতিবাচক। বাংলা ভাষার যে নিজস্ব ধ্বনি-পদ্ধতি, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যরীতি রয়েছে সে কথা জোরালো ও স্পষ্টভাবে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী *ভারতী* পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সংখ্যায় 'নূতন বাংলা ব্যাকরণ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ামূলক জবাবে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, "... বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১২১) *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় পৌষ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন : "প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ২০)

বাংলা ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য-চেতনার পরোক্ষ পরিচয় ফুটে উঠেছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধে। এগুলি হচ্ছে : 'বাংলা উচ্চারণ'[১], 'স্বরবর্ণ অ'[২], 'স্বরবর্ণ এ'[৩] ও 'টা টো টে'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার (১৮৯৩) পর এই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান ও এর মুখপত্র *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*কে কেন্দ্র করে বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে বাংলা ব্যাকরণ চর্চা নতুন মাত্রা পায়। গড়ে ওঠে দুটি ধারা। এক দিকে সংস্কৃতানুসারী প্রথাবদ্ধ ব্যাকরণকাররা, অন্যদিকে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার নতুন ব্যাকরণ চিন্তকদের একটি গোষ্ঠী। সংস্কৃতানুসারীদের দলে ছিলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। এরা "বাঙলা ভাষার স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না; বাঙলা তাঁদের কাছে সংস্কৃতেরই একরকম কথ্য-বিকৃত-প্রাকৃতরূপ, যাকে সংস্কার ক'রে পুনরায় সংস্কৃত ক'রে তোলা সম্ভব।" (হুমায়ুন, ১৯৮৪ : চব্বিশ) শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী এই দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন এবং এর সবকিছুই সংস্কৃতের অনুরূপ। আর নব্য ব্যাকরণচিন্তকদের পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ।[৫] এঁরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা বলে মেনে নেন নি। তাঁদের অভিমত, বাংলা ভাষার সম্পর্ক প্রাকৃতের সঙ্গে। "তাঁরা দেখেছেন ধ্বনিতে, শব্দে, বাক্যে, অর্থে সংস্কৃতের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান বাঙলার। যদিও বাঙলা ভাষা

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মস্থ ক'রেছে বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ, তবুও বাঙলা হ'য়ে উঠেছে একটি পৃথক ভাষা, যার ব্যাকরণ হবে পৃথক।" (হুমায়ুন, ১৯৮৪ : চব্বিশ) তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত ব্যাকরণ পরিহার করে বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৯৪ সালের ১৭ জুন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদে যোগ দেওয়ার পর তিনি কেবল বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার জন্য বাঙালির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাননি, ব্যাপক অধ্যয়ন, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও আন্তরিক নিষ্ঠায় বাংলা ভাষার স্বরূপ অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার পথ সুগম করে গেছেন।

২

ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ নিতে হয়েছিল।[৬] এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পরবর্তীকালে সংস্কৃত রীতির অনুসরণে লেখা বাংলা ব্যাকরণগুলি দেখে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সেগুলির কোনোটিই যথার্থ অর্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছিল না। তা ছাড়া বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এবং বাংলা ব্যাকরণ চর্চা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ পাঠ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ইংরেজ সিভিলিয়ান জন বীমস্ রচিত আধুনিক আর্য ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ (*Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India*, 1872), রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের *তুলনামূলক ব্যাকরণ* (১৮৭৭), জর্জ গ্রিয়ার্সনের *Lingistic Survey of India* (প্রথম খণ্ড ১৯০৩)। এ ছাড়াও রেভারেন্ড এন ব্রাউনের অসমিয়া ব্যাকরণ (*Grammatic Notice of the Assamese Language,* ১৮৪৮), হর্নলের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ (*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, 1880), কেলগের হিন্দি ব্যাকরণ (*A Grammatic of the Hindi Language,* (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৬, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৯২), গ্রিয়ার্সনের মৈথিলি ব্যাকরণ (*Maithili Grammar for an Introduction to the Mithili Dialect of the Bihari Language of North Bihar*) ইত্যাদি। এসব গ্রন্থ যে তিনি পাঠ করেছিলেন তা তাঁর 'বাংলা বহুবচন' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়।[৭] ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে চিন্তার ঐক্য লক্ষ করে নির্মল দাশ ধারণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী সেস (A H Sayce)-এর *The Principles of Comparative Philology* (১৮৭৪) এবং হুইটনি (William Dwight Whitney)-র *The Life and Growth of Language* (১৮৭৫) পড়ে থাকবেন (নির্মল দাশ, ১৯৮৭ : ৩০৮)। রবীন্দ্রনাথ জার্মান ভাষাবিজ্ঞানী কার্ল ব্রুগম্যানের ইন্দো-জার্মান ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ (*Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages*) বইটিও পড়েছিলেন। তাঁর *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধের শুরুতেই (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ৭৫) বইটির উল্লেখ আছে।[৮]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তখন বাংলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত যে বিতর্ক হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ নব্য ব্যাকরণচিন্তকরা ছিলেন মান্য মৌখিক চলিত বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণ রচনার পক্ষে। পক্ষান্তরে সংস্কৃতপন্থীরা ছিলেন লিখিত সাধু বাংলার ব্যাকরণ রচনার পক্ষে। সংস্কৃতপন্থীরা বাংলা ব্যাকরণের শব্দভাণ্ডারকে কেবল সাধুভাষার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে সীমিত রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিষ্ট বাংলার পাশাপাশি অশিষ্ট নামাঙ্কিত শব্দকেও ব্যাকরণের আওতাভুক্ত করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে লেখেন :

> বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। ... ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। ... ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে ... সাধু ভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যাবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১১১)

এ দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ করে বর্ণনামূলক ব্যাকরণে সংশ্লিষ্ট ভাষার সব ধরনের শব্দই বিবেচনার দাবি রাখে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সেই বহুকাল আগে লালন করে ব্যাকরণ-ভাবনার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছেন।

৩

বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ চর্চায় তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। তার প্রমাণ রয়েছে *বাংলা শব্দতত্ত্ব* (১৩৪২)[৯] গ্রন্থে সংকলিত তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে এবং মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ৭৮ বছর বয়সে প্রকাশিত *বাংলাভাষা-পরিচয়* (১৯৩৮) গ্রন্থে।[১০]

বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের কাঠামো কী রকম হবে তা রবীন্দ্রনাথ নির্ধারণ করে দেন নি, কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের পরিমণ্ডল চিহ্নিত করতে এবং বাংলা ভাষার স্বরূপ বিচার-বিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণ রচনার পন্থা নির্দেশে সচেষ্ট হয়েছেন। নিজের ব্যাকরণ ভাবনার আলোকে একটা নমুনা ব্যাকরণ প্রকাশের উদ্যোগও তিনি নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা বিষয়ক তাঁর প্রধান সহযোগী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীকে দিয়ে একটি ব্যাকরণ তিনি লিখিয়ে নেন এবং সেটি আদ্যন্ত পরিমার্জনা ও সংযোজন করেন। কিন্তু অন্যের হাতে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়।[১১]

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সীমিত পরিসরে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। এতে বাংলা ভাষার যে বর্ণনাত্মক পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাতে তাঁর ব্যাকরণ ভাবনার মর্মবস্তু ও আদল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা চলে। এটি বাংলা *শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের মতো বিচ্ছিন্ন রচনার সংকলন নয়, এ গ্রন্থের পুরো আলোচনা

ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত। সুকুমার বিশ্বাসকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, এটি "ব্যাকরণ নয়, ভাষাবিজ্ঞান নয়, ভাষাচিন্তা ও ভাষাচর্চার অভিনব প্রয়াস।" (সুকুমার, ২০০৪ : ৪২) *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ ভাবনার যে সূচনা তার উত্তরণ ঘটেছে *বাংলা ভাষা পরিচয়ে*। এ সম্পর্কে নির্মল দাশ লিখেছেন :

> 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে যে ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহের সূচনা 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' তারই সুষ্ঠু পরিণতি ঘটেছে। 'শব্দতত্ত্বে'র প্রবন্ধগুলি কখনো বিশেষ সমসাময়িক উপলক্ষে, কখনো বা বাদ-প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ তাড়নায় রচিত, ফলে প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও সামগ্রিকভাবে রচনাগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করা যায়। কিন্তু 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' বিশ্লেষণের বৈচিত্র্য থাকলেও বক্তব্যে একটা অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডতা আছে। (নির্মল, ১৯৮৭ : ৩০৭)

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার উভয় রীতির স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হন নি, তিনি কেবল চলিত রূপের পরিচয় তুলে ধরায় সচেষ্ট হয়েছেন।[১২] কারণ ভাষাকে তিনি জীবন্ত ও সদা-সক্রিয় সমাজ মানসের নিরন্তর প্রবহমান অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, সেই অভিব্যক্তি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় চলিত ভাষায়। সাধু রীতিকে তাঁর কাছে মনে হয়েছে আড়ষ্ট ও বিলীয়মান, পক্ষান্তরে চলিত ভাষা জীবন্ত ও ক্রমবিকাশমান (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ৩৮-৩৯)। চলিত বাংলার রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষা হচ্ছে 'ভঙ্গিপ্রধান ভাষা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ১১০)। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে তিনি এই ভঙ্গির বিশিষ্টতার পরিচয় তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

৪

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন গভীর আগ্রহে ও একান্ত নিষ্ঠায়। বিভিন্ন প্রবন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে তা করা হলেও মোটামুটিভাবে সেগুলির মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের কিছু দিক আলোকিত হয়েছে। সেই সাথে ধ্বনিপ্রতীকতা, রূপধ্বনিতত্ত্ব, রূপার্থতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গও এসেছে।

বাংলাভাষা-পরিচয় সম্পর্কে পবিত্র সরকারের মূল্যায়ন :

> রবীন্দ্রনাথের বই মূলত বাংলাভাষার স্বভাব ও স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং এই চেষ্টা তাঁর মতো করে আজ পর্যন্ত কেউ করেননি, সত্যের খাতিরে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। একদিকে ভাষার সর্বাঙ্গীণ রূপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীসুলভ সচেতনতা, অন্যদিকে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ বোধ — রবীন্দ্রনাথের এ বইটিকে সমস্ত পণ্ডিতি আলোচনা থেকে এক অভিনব স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। (পবিত্র, ১৯৯২ : ৫৩)

বাংলা শব্দতত্ত্ব ও *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ ভাবনার প্রধান কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ধ্বনির যে বিবরণ পাওয়া যায় তা সংস্কৃত ব্যাকরণে বিধৃত সংস্কৃত ধ্বনির বর্ণনার অনুরূপ। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনিশৃঙ্খলা সংস্কৃত থেকে ভিন্ন। অনেকেই এটা অনুধাবন করতে পারেন নি। পারলেও বাংলা ধ্বনির বর্ণনায় সংস্কৃত রীতির দ্বারস্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক যিনি বাংলা উচ্চারণরীতি সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন এবং বাংলা ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র বিধিবদ্ধ করেছেন। 'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ', 'টা টো টে', 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ'[১৩] ইত্যাদি প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে তিনিই প্রথম বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনার সূত্রপাত করেন। বাংলা উচ্চারণ যে অনেক ক্ষেত্রে লিপিসংবাদী নয়, তা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ করেন। বিভিন্ন ধ্বনিপ্রতিবেশে ধ্বনির রূপধ্বনিগত পরিবর্তনের দিকটিও তিনি লক্ষ করেছিলেন। তাঁর এসব প্রবন্ধে বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সূত্র রচনার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। যেমন : বাংলা 'অ' ধ্বনি কোন কোন ধ্বনিপ্রতিবেশে 'ও'-বৎ উচ্চারিত হয় তার এবং 'এ' ধ্বনি কোন কোন ধ্বনিপ্রতিবেশে 'অ্যা' উচ্চারিত হয় তার সূত্রগুলি তিনিই প্রথম নিরূপণ করেন। 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে 'অ' ধ্বনির 'ও'-বৎ উচ্চারণের আটটি সূত্র নির্দেশ করেছেন তিনি। যেমন :

১. পরে ই/ঈ অথবা উ/ঊ কিংবা ই/ঈ কারান্ত বা উ/ঊ কারান্ত ব্যঞ্জন থাকলে পূর্ববর্তী 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : অগ্নি, অগ্রিম, অধুনা ইত্যাদি;
২. য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের আগের 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : গণ্য, লভ্য ইত্যাদি;
৩. পরে ক্ষ থাকলে আগের 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : কক্ষ, লক্ষ ইত্যাদি;
৪. ক্রিয়াপদের অ-পরবর্তী ই/ঈ-ধ্বনি লোপ পেলে 'অ' ধ্বনি 'ও'-বৎ উচ্চারিত হয়। উদাহরণ : পড়িল–প'ল, মরিল–ম'ল, করিয়া–ক'রে ইত্যাদি;
৫. ঋ-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের আগের 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : কর্তৃক, মসৃণ ইত্যাদি;
৬. দুটি বর্ণবিশিষ্ট শব্দের শেষ বর্ণটি ন/ণ হলে আগের 'অ' ধ্বনি 'ও'-বৎ উচ্চারিত হয়। উদাহরণ : ক্ষণ, পণ, বন, মন ইত্যাদি;
৭. ক্রিয়ার উ-কারের লোপ হলে আগের 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : হউন-হ'ন, কহুন–ক'ন ইত্যাদি;
৮. র-ফলাযুক্ত বর্ণে 'অ' থাকলে সেই 'অ'-র উচ্চারণ 'ও'-বৎ হয়। উদাহরণ : গ্রহ, ভ্রমণ ইত্যাদি। কিন্তু পরে 'য়' থাকলে 'অ'-র উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। উদাহরণ : ক্রয়, ত্রয়; (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১৮-১৯)।

'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা এ ধ্বনির দুই ধরনের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি বিশুদ্ধ বা স্বাভাবিক 'এ', অন্যটি 'অ্যা'।[১৪] এই প্রবন্ধে তিনি 'এ'র বিশুদ্ধ উচ্চারণের এবং অ্যা উচ্চারিত হওয়ার কিছু সূত্র নির্দেশ করেছেন। যেমন :

১. পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে আগের এ-র উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। উদাহরণ : জেঠা–জেঠি, বেটা-বেটি ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ পার্থক্য।

২. যেসব অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই থাকে বিশেষ্য রূপ গ্রহণের সময় ই-কার বদলে এ-কারে পরিণত হয় এবং সেই এ-র উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অবিকৃত এ হয়। পক্ষান্তরে যেসব অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে এ থাকে বিশেষ্য রূপ গ্রহণের সময় এ-কার বদলে অ্যা-কারে পরিণত হয়। যেমন : বেচিয়া–বেচা, ঠেলিয়া–ঠেলা, দেখিয়া–দেখা ইত্যাদি।
৩. পরে ন থাকলে আগের এ-কারান্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ অ্যা হয়। উদাহরণ : কেন, যেন, হেন ইত্যাদি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ২৩-২৫)।

এভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাকে হুমায়ুন আজাদ মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :

ঠিক প্রথাগত নয় এবং 'আধুনিক'ও নয়, এমন ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ... তাঁর বর্ণনাকে আপাতদৃষ্টিতে বর্ণনামূলক ব'লে মনে হয়, কিন্তু তিনি লিখিত বানান অনুসারে ধ্বনিসূত্র রচনা করেছেন ব'লে ওই বর্ণনা ঠিক আধুনিক বর্ণনামূলক হয়ে ওঠে নি, কিন্তু আনুশাসনিক বিধান হিশেবে তাঁর সূত্ররাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (হুমায়ুন, ১৯৮৪ : আটাশ)

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্বরধ্বনির পরিবর্তনের যেসব উদাহরণ তিনি দিয়েছেন সেগুলি ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় স্বরসঙ্গতির পর্যায়ে পড়ে। তাঁর নির্দেশিত সূত্রের অনেকগুলি বাংলা ব্যাকরণে গৃহীত হয়েছে।

বাংলা উচ্চারণ তথা ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের দক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়ে পবিত্র সরকার লিখেছেন :

'কোন্ ধ্বনি বদলাচ্ছে, তা বদলে কী দাঁড়াচ্ছে — তাই যে তিনি শুধু লক্ষ করেছেন তাই নয়, তা কীসের প্রভাবে বদলাচ্ছে তা-ও তিনি আবিষ্কার করেছেন। অর্থাৎ রূপান্তরের বাইরের চেহারা এবং ভেতরকার কারণ দুই-ই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এমন-কী কারণের ভিতরকার যে-কারণ, অর্থাৎ উচ্চারণ করতে গিয়ে জিভের যে শর্টকাট নেওয়ার চেষ্টা — তা-ও তাঁর নজর এড়ায়নি। ... অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বরধ্বনির পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি আদ্যন্ত, কারণসুদ্ধ লক্ষ করেছেন। (পবিত্র, ১৯৯৯ : ৫৬-৫৭)

বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণরীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতটা আলোচনা করেছেন সে তুলনায় ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ততটা করেন নি। বলা যায়, এ বিষয়ক আলোচনা খুবই কম। *বাংলা শব্দতত্ত্ব* ও *বাংলাভাষা পরিচয়* দুটি গ্রন্থেই বিচ্ছিন্নভাবে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। শিস ধ্বনির (শ, ষ, স) উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, শিস ধ্বনিগুলির উচ্চারণ সাধারণভাবে 'শ'। তবে অনেক ক্ষেত্রে 'স'-এর নিজস্ব স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি কখনো কখনো শ-এর উচ্চারণ স-এর মতো হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১৭, ৫৩; ১৯৩৮ : ৭৫-৭৬)। এ ছাড়াও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন য-ফলা, অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব, অন্তস্থ য ও বর্গীয় জ এবং ক্ষ-র উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১৭, ৫৩; ১৯৩৮ : ৭০-৭২, ৭৬)।

সমকালিক বা চালু (Synchronic) পদ্ধতিতে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনা করে পবিত্র সরকার দেখিয়েছেন, বাংলা ধ্বনির স্বরোচ্চতাসাম্যের (Vowel Hight Assimilation) বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায় নি (পবিত্র, ১৯৯৯ : ৫৭-৫৮)। এ বিষয়ে ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : "রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাংলা ভাষার স্বরসাম্যের নিয়ম (Law of Harmonic Sequence or Vocalic Harmony) আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি।" (উদ্ধৃত : পবিত্র, ১৯৯৯ : ৫২) রবীন্দ্রনাথ 'টা' (উদাহরণ : একটা), 'টো' (উদাহরণ : দুটো) ও 'টে' (উদাহরণ : তিনটে) উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতার মধ্যে ঐতিহাসিক বা ডায়াক্রনিক রূপধ্বনিগত পরিবর্তনের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (পবিত্র, ১৯৯৯ : ৫৯)।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে সাধারণত বাংলা শব্দ ও পদের গঠনপ্রণালি আলোচিত হয়। শব্দগঠনের রূপতত্ত্বে প্রধানত সমাস, প্রত্যয় ও উপসর্গ বিষয়ে আলোচনা স্থান পায়। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা শব্দ ও পদগঠনের যে বর্ণনা করা হয় তা প্রায় সর্বাংশে সংস্কৃত রীতিপদ্ধতি-নির্ভর। প্রথাগত ব্যাকরণে বিভিন্ন সমাসের শ্রেণিকরণ, সমাসের নাম, সমাসবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে হুবহু নেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা শব্দগঠনের প্রকৃতি অনুসন্ধানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি যে বাংলা ভাষা বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের নাম রেখেছিলেন *শব্দতত্ত্ব* তা তাঁর এ সংক্রান্ত ভাবনার পরিচায়ক। *বাংলা ভাষা পরিচয়* গ্রন্থেও তিনি শব্দগঠনরীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ দুটি গ্রন্থে এ ছাড়াও আলোচিত হয়েছে বাংলা প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য, এবং দৈনন্দিন জীবনে বিচিত্র ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের শক্তিসামর্থ্য ও অর্থব্যাপকতা ইত্যাদি। তিনি 'বাংলা শব্দদ্বৈত'[১৫], 'ধন্যাত্মক শব্দ'[১৬] এবং 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত'[১৭] প্রবন্ধে বাংলা শব্দগঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারের ভাবপ্রকাশক শক্তিমত্তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে আছে শব্দদ্বৈতের অর্থ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ।

বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও সেগুলি বাংলা ভাষায় আলাদা ধাঁচ পেয়েছে। তাই সেগুলিকে তিনি সংস্কৃত বলে মানতে রাজি নন।

'বাংলা শব্দদ্বৈত', 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা'[১৮] প্রবন্ধে তিনি সেই সব উপাদান ব্যবহার করেছেন যেগুলি একেবারে বাংলার নিজস্ব এবং প্রথাগত ব্যাকরণে যেগুলি মর্যাদা বা স্থান পায় নি।

ধন্যাত্মক শব্দ যে বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ এবং তা যে বাংলা শব্দভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য অংশ তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ করেছিলেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের গুরুত্ব

বিবেচনা করে তিনি এ ধরনের ৪৩৮টি শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকাও তৈরি করেন। তা ছাড়া ধ্বনির সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ-বৈচিত্র্য আবিষ্কারেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'ধন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে এ ধরনের শব্দের অর্থপ্রকাশক্ষমতা ও অর্থবৈচিত্র্য নিরূপণ করে চমকপ্রদ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে ধ্বনিপ্রতীকতা তত্ত্বের। 'ভাষার ইঙ্গিত'[১৯] প্রবন্ধে তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ও বর্ণনামূলক ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে বলা হয় শব্দগঠনের রূপতত্ত্ব তার নমুনা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার লক্ষ্য মাথায় রেখে লেখা গবেষণা-ঋদ্ধ এই প্রবন্ধে তিনি কেবল খাঁটি বাংলা প্রত্যয় শনাক্ত করেন নি, সংস্কৃত প্রত্যয়ের তুলনায় খাঁটি বাংলা প্রত্যয়ের প্রকাশভঙ্গির পার্থক্যও চিহ্নিত করেছেন। এগুলির গঠন-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে নিরূপণ করেছেন শব্দগঠনে এদের ভূমিকা। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন এদের ব্যঞ্জনাধর্মী বৈশিষ্ট্য যা ছাপিয়ে ওঠে আভিধানিক অর্থকে। বাংলায় নারীবাচক প্রত্যয়ের প্রয়োগ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন চলিত বাংলায় সংস্কৃত নারীবাচক প্রত্যয়ের অসংগত ব্যবহার সম্পর্কে। প্রচলিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে কোনগুলি বাংলা প্রত্যয় হিসেবে বিবেচ্য তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, একথা মানি না। ... বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ... যে সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দ সহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোন আদান প্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ৯০)।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের প্রশংসা করে পবিত্র সরকার লিখেছেন : "এখানে বাংলাভাষার (অর্থাৎ মান্য চলিত মৌখিক বাংলার) প্রত্যয়-প্রকরণ অত্যন্ত ব্যাপক গবেষণার দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই একটি লেখাই রবীন্দ্রনাথকে ভাষাবিজ্ঞানী পদবি দেওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি।" (পবিত্র, ২০০৫ : নয়) এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের অভিমতও স্মরণীয় :

> খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ রচনার পদক্ষেপ হিশেবে যে-সমস্ত প্রবন্ধ রচিত হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' সেগুলোর অন্যতম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধটি সংস্কৃতপন্থীদের আতঙ্কিত করেছিলো, এবং অনুপ্রাণিত করেছিলো খাঁটি বাঙলাপন্থীদের। বাঙলা প্রত্যয়গুলোর জন্যে সংস্কৃত নামের বদলে নতুন নাম উদ্ভাবন বাঙলা ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে একটি বড়ো পদক্ষেপ। (হুমায়ুন, ১৯৮৪ : ১৮১)

শব্দগঠন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কেবল প্রত্যয়ের মধ্যে সীমিত ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি আরও আলোচনা করেছেন *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে। সেখানে শব্দগঠনে সমাসের আলোচনায় তিনি সমাসকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে না দেখে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠনের কৌশল হিসেবে দেখেছেন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ১১৭)। এ ছাড়াও আলোচিত হয়েছে শব্দগঠনে ধ্বন্যাত্মক শব্দ (কটমট, টনটন ইত্যাদি), শব্দদ্বিত্ব (টাটকা টাটকা, গরম

গরম ইত্যাদি), জোড়মেলানো শব্দ (ওষুধপত্র, লোকলস্কর ইত্যাদি) ও বাগ্‌ধারার (আকাশ থেকে পড়া, তেলে বেগুনে জ্বলা ইত্যাদি) ভূমিকা (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ১১৮-১২০)।

বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এবং 'সম্বন্ধে কার'[২০] প্রবন্ধ দুটি রচিত হয়েছে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধাঁচে। আর 'বাংলা বহুবচন'[২১] প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন তা ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে তিনি বহুত্ববাচক শব্দ (সব, সকল, যত, তত, যতসব) ও বহুত্ববাচক প্রত্যয়ের (রা, গুলি, গুলো) প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

'বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশক প্রত্যয়ের (টা, টি) সহযোগে বিশেষজাত বিশেষ্য গঠনের দিকটি সম্যকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন : 'বিশেষণ পদের সঙ্গে 'টা' 'টি' যুক্ত হয় না। যদি যুক্ত হয় তবে তাহা বিশেষ্য হইয়া যায়। যেমন, 'অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে', 'অর্ধেকটা রাখো', 'একটা দাও', 'আমারটা লও', 'তোমরা কেবল মন্দটাই দেখো' ইত্যাদি।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১৪৫-১৪৬)

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে সর্বনাম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগভঙ্গির আলোকে সর্বনামের শ্রেণিকরণ করেছেন। আলোচনা করেছেন বাংলা বিভক্তিগুলোর প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। তুলে ধরেছেন বাংলা ক্রিয়াপদের প্রকাশক্ষমতার বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে।

'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' প্রবন্ধটিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে ৫৮০টি খাঁটি বাংলা মৌলিক ক্রিয়াপদ সংকলনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণের প্রকৃতি নির্মাণে গতি সঞ্চার করেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষার পরিবর্তে বাংলা পরিভাষা তৈরির গুরুত্বও রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন।

বাংলাভাষার রূপতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বর্ণনামূলক রীতিতে বাংলা ভাষার স্বরূপ নিরূপণ ও রূপবৈচিত্র্য বিচার। এক কথায় আধুনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণে যাকে বলা হয় শব্দগঠনের রূপতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ ভাবনায় সে দিকটি নানাভাবে এসেছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বিভক্তি, প্রত্যয়, নির্দেশক চিহ্ন ইত্যাদি রূপমূল বা মরফেম নিয়ে আলোচনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এদের ধ্বনিগত বিবর্তন এবং প্রতিবেশ-নির্ভর অর্থবাচকতার বৈচিত্র্য নিরূপণেও তিনি কুশলতার পরিচয় রেখে গেছেন।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সীমিত। এ ক্ষেত্রে তাঁর নজর ছিল প্রধানত সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্যের মধ্যে নিবদ্ধ। তবে বাক্যের পদবিন্যাস রীতির বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন চলিত রীতিতে পদবিন্যাসের স্বাধীনতাকে। সংস্কৃতের তুলনায় পদবিন্যাসের অনেক স্বাধীনতা আছে বলেই বাংলা ভাষায় চলিত রীতিতে

একদিকে ঘটে অর্থবৈচিত্র্য, অন্যদিকে দূর করা যায় একঘেয়েমিকে (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ১২১)।

কারকের আলোচনায় তিনি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে বাংলা ভাষায় সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন এবং বাংলা ব্যাকরণ থেকে সম্প্রদান কারক তুলে দেওয়ার পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। ... 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন কারক এবং এক বাংলা কর্ম কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ১০৬-১০৭)

বাগর্থতত্ত্ব

ভাষার সঙ্গে ভাবপ্রকাশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে ব্যাকরণ চর্চায় শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনা বিচারের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। বাচনিক প্রক্রিয়ায় শব্দ প্রায়শ আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে যায়, সৃষ্টি করে নানা ব্যঞ্জনা। "শব্দের এই ব্যঞ্জনাই ভাষাকে কাব্যিক সৌন্দর্য ও কলাকুশলতা দান করেছে, একটি সামগ্রিক ঐক্য ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। শব্দের সেই অর্থোদ্ধারই বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অংশ, তার শব্দার্থবিজ্ঞানের কাজ।" (মুহম্মদ, ১৩৭৫ : ৬৩) *বাংলা শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থে দ্বৈতশব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শব্দের অর্থ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একই শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলায় যে কালিক দীর্ঘতা, ব্যাপকতা, প্রগাঢ়তা ইত্যাদির দ্যোতনা দেওয়া হয় তা শব্দদ্বৈত ও ধন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন। এ ছাড়া বিশেষণ শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে বহুবচনের ভাব প্রয়োগের পন্থার দিকেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ শব্দের অর্থগত বৈচিত্র্য ও মহিমা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থই বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে' খাঁটিবাংলা ভাষার নিরলঙ্কার ও টুকিটাকি শব্দ ও শব্দকণিকার পেছনে যে কি ব্যঞ্জনা নিহিত আছে জহুরীর মতো তার পরিচয় দিয়েছেন।" (মুহম্মদ, ১৩৭৫ : ৬৩-৬৪)

৫

বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পথিকৃতের। তাঁর ব্যাকরণ ভাবনা বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ইতিহাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই ভাবনায় বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার যৌক্তিকতা যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ রচনার পথ ও পন্থা দেখিয়ে গেছেন। এভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার বিষয়ে ক্রমিক সচেতনতা বাংলা ব্যাকরণের রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় নানা আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে বাংলা ব্যাকরণের স্বরূপ-প্রকৃতি।

টীকা

১. প্রথম প্রকাশ : *বালক*, আশ্বিন, ১২৯২

২. প্রথম প্রকাশ : *সাধনা*, আষাঢ়, ১২৯৯

৩. প্রথম প্রকাশ : *সাধনা*, কার্তিক, ১২৯৯

৪. প্রথম প্রকাশ : *সাধনা*, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, ১২০০

৫. এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের অগ্রজকল্প দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা বাঙলাভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরবার চেষ্টা ক'রেছিলেন আর জোর গলায় ব'লেছিলেন যে, সংস্কৃতের সব নিয়ম বাঙলায় চ'লবে না, বাঙলার নিজস্ব স্বরূপটিকে ধ'রে দিতে হবে, যেটি বাঙলাকে চিরকাল ধ'রে সংস্কৃতের সঙ্গে এক দড়িতে বেঁধে রাখ্‌বে না। এই দুইজন মনীষী হ'চ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এঁদের পথেরই পথিক ছিলেন, আর মনে হয় এঁদের চেয়ে আগেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছিল।' (সুনীতিকুমার, ১৩৬৮ : ১৮২)

৬. *জীবনস্মৃতি*-তে তিনি লিখেছেন : 'ইহারই মাঝে এক সময়ে হেরম্ব তর্করত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৬ : ৪২৪)

৭. *ভারতী* পত্রিকার ৫ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাংলা বহুবচন' প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দীনেশচন্দ্রবাবুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, হর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্ সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামী ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।' (শ্রীমদনমোহন কুমার, ১৩৮১ : ৮৬)

৮. *শব্দতত্ত্ব* গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়ে' বলা হয়েছে : '*Elements of theComparative Grammar of the Indo-Germanic Languages* গ্রন্থের যে কপিটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই কপির অনেক পৃষ্ঠায় পেন্সিলে তাঁর মার্জিন-নোট দৃষ্ট হয়।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ৪৪২)

৯. *বাংলা শব্দতত্ত্ব* বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৯) *শব্দতত্ত্ব* নামে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এর নাম বদলে রাখা হয় *বাংলা শব্দতত্ত্ব* । এই সংস্করণে অনেকগুলি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়। ১৩৯১ বঙ্গাব্দে এর স্বতন্ত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাতে আরও অনেক প্রবন্ধ, আলোচনা ও চিঠিপত্র সংযোজিত হয়। এই সংস্করণের গ্রন্থ পরিচয়ে এ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পাওয়া যাবে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯১ : ৪০৯-৪৪১)

১০. *বাংলাভাষা-পরিচয়* ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১১. এ বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য দেখুন : নির্মল, ১৯৮৭ : ৩০৬-৩০৭

১২. প্রসঙ্গে 'ভূমিকা'য় তিনি লিখেছেন : 'এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত ভাষা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৮ : ৮)

১৩. বাংলা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন জন বীমস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তাঁর রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (*Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial*) নিয়ে আলোচনা করার জন্যে পরিষদে জমা দেন। পরিষদে এর উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। পরে *ভারতী* পত্রিকার পৌষ ১৩০৫ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' শিরোনামে এক প্রবন্ধে বীমসের বিশ্লেষণ কুশলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যৌক্তিক আলোচনা করেন এবং এই সূত্রে আলোকপাত করেন বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতির কিছু বিশিষ্টতা সম্পর্কে।

১৪. এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষররূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর-একটি অ্যা। এক এবং একুশ শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।' (রবীন্দ্রনাথ ১৩৯১ : ২৩)

১৫. প্রথম প্রকাশ : *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, প্রথম সংখ্যা, ১৩০৭

১৬. প্রথম প্রকাশ : *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৭

১৭. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৮ সালের ১২ আশ্বিন পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। প্রথম প্রকাশ : *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩০৮

১৮. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পুস্তিকা আকারে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৯. ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩১১ সালের ১৪ জ্যৈষ্ঠ (২৭এ মে ১৯০৪) প্রথম বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। প্রথম প্রকাশ : *ভারতী*, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩১১।

২০. প্রথম প্রকাশ : *ভারতী*, শ্রাবণ, ১৩০৫

২১. প্রথম প্রকাশ : *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩১৮

রচনাপঞ্জি

অলিভা দাক্ষী (১৪১০)। 'রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভাবনায় 'শব্দতত্ত্ব'', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, কলকাতা, পৃ. ১৪০-১৪৬

নির্মল দাশ (১৯৮৭)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

পবিত্র সরকার (১৯৯৯)। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', *ভাষামনন : বাঙালি মনীষা*, পুনশ্চ, কলকাতা।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৩৭৫)। 'ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ', *রবীন্দ্রনাথ*, [সম্পা. আনিসুজ্জামান], স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৬৮, পৃ. ৩৮-৬৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯১)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

(১৩৯৬)। 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (নবম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(১৩৯৮)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(১৯৩৮)। *বাংলাভাষা-পরিচয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

শ্রীমদনমোহন কুমার (১৩৮১)। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস* (প্রথম পর্ব), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

সিরাজুদ্দীন আমেদ (২০০০)। *রবীন্দ্রনাথের ভাষা চিন্তা*, বাণীপ্রকাশ, কলকাতা।

সুকুমার বিশ্বাস (২০০৪)। 'রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা : একটি সমীক্ষা', *আকাদেমি পত্রিকা*, কলকাতা। পৃ. ৩৭-৫২

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (১৩৭২)। *রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা*, রবীন্দ্রায়ণ (প্রথম খণ্ড) [সম্পা. পুলিনবিহারী সেন], বাক্-সাহিত্য, কলকাতা, পৃ. ১৭৯-১৮৫

হুমায়ুন আজাদ [সম্পা.] (১৯৮৪)। *বাঙলা ভাষা* (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

হোসনে আরা*

সৃষ্টিশীল প্রতিভা সমাজ ও সমকাল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নয়, সংশ্লিষ্ট থেকেই পূর্ণতা পায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রথমাবধি বাস্তবতার ভূমিতে শেকড় বিস্তার করে বেড়ে উঠেছে। বিশেষত বাংলা কথাসাহিত্যের দিকনির্দেশকরা জীবনঘনিষ্ঠ রচনাতে স্বচ্ছন্দ থেকেছেন পূর্বাপর। ওই ধারার সফল উত্তরসূরি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) সস্তা ভাবালুতা বর্জন করে আমৃত্যু স্বদেশ-স্বসমাজের মানুষের জীবন বিশেষত সংগ্রামী জীবনকে উপজীব্য করে সাহিত্য রচনা করেছেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত এ সাহিত্যিক ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ, কঠোর যুক্তিবাদ, সংস্কারমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র অথচ স্থায়ী আসন অধিকার করেছিলেন অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর কথাসাহিত্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়ে বহুকৌণিক মাত্রিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক ঘটনা। জাতিগত পরিচয়কে গৌণ করে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেবার মানসিকতা এবং মুখ্যত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ইন্ধনে কিছু সুযোগসন্ধানী অর্থলোলুপ লোকের দ্বারা এদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেয়া ধর্মীয় বিভেদের প্রত্যক্ষ ফলই এই দাঙ্গা। চতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রভাব এবং বাজার স্থায়ীকরণে অখণ্ড বাংলার বিভাজনকে সুনিশ্চিত করতে পরিকল্পিতভাবে স্বাধীনতার ঠিক একবছর পূর্বে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের আয়োজন করে। শাসকগোষ্ঠীর এই পরিকল্পনা এবং মানবতার চরম অবমাননাকর পরিস্থিতির পটভূমিতে এ উপমহাদেশের মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন — কৃষণ চন্দর উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন *গাদ্দার*, বাংলা ভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন সুদীর্ঘ উপন্যাস *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), এবং বেশ কিছু ছোটগল্প — খতিয়ান (*খতিয়ান*), ভালবাসা (*ছোটবড়*), ছেলেমানুষি (*ছোটবড়*) এবং স্থানে ও স্তানে (*ছোটবড়*) প্রভৃতি।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে তিনদিনব্যাপী যে পৈশাচিক তাণ্ডব চলে কলকাতা শহরজুড়ে তাতে সরকারি হিসেবেই নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে তিন হাজার এবং আহত সাড়ে চার হাজার। দেড়লক্ষ লোকের শহরত্যাগ ও নব্বই হাজার মানুষের দুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে। (অমলেন্দু, ১৯৮৯ : ১৯৭) সাম্প্রদায়িক বিভীষিকার এই ভয়ালরূপ কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না — ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। কলকাতার (১৬-১৮ আগস্ট) পরে বোম্বে (১ সেপ্টেম্বর), নোয়াখালি (১০ অক্টোবর), বিহার(২৫ অক্টোবর),গড় মুক্তেশ্বর (নভেম্বর) ও পাঞ্জাব (মার্চ ১৯৪৭)সহ সমগ্র দেশে এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আনুমানিক এক লক্ষ আশি হাজার লোক প্রাণ হারায়। এই নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেদনাহত করেছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধে বা শান্তি স্থাপনে সক্রিয়ভাবে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তিনি কলকাতার রাস্তায় নেমেছেন এবং একজন কমিউনিস্ট হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সন্দেহভাজন হয়ে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত পেয়েছেন, তবু পিছু হটেননি। তাছাড়া একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এই সংঘাতের পেছনে শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সাধারণকে জানাতে চেয়েছেন তিনি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতেই রচনা করেছেন *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি। এ উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস বর্ণনা প্রকট নয়, বরং বিভীষিকায় বিমূঢ় স্বতন্ত্র মানুষের মনোলোক অবলোকন এবং সেই সঙ্গে একজন বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মীর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ঘটনার বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৪৬-এর ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট তিনদিনব্যাপী কলকাতায় যে নৃশংস ধর্মোন্মদনায় অসংখ্য প্রাণহানি এবং বিভীষিকার সৃষ্টি হয়, সেই পটভূমিতে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি। তবে সুদীর্ঘ এ উপন্যাসের কাহিনিকাল কেবল ওই তিনদিনই নয়, বরং ১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা দিবসের দিন তিনেক আগে' পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৎসরাধিক কাল কলকাতা নগরবাসী যে আতঙ্ক, অস্বস্তি এবং সংঘাতের মধ্যে দিন কাটিয়েছে তারই চালচিত্র অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক কিছু ঘটনা ও চরিত্রের কথোপকথন ও মানসিক চিন্তার বয়নে। বস্তুত, পুরো বছর জুড়েই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সুযোগসন্ধানী লোকেরা বিভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা উস্কে নতুন করে এলাকাভিত্তিক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টায় ছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু এলাকায় মুসলমান পরিবারের বসবাস বা প্রবেশ যেমন অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তেমনি মুসলমান পাড়াতেও হিন্দুরা নিরাপদ ছিল না। এ উপন্যাসে তাই প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী প্রণবের বাড়িতে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত পাঁচ-ছটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্যদের ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি হলেও এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুড়ো নানি ও তার পরিবার এবং সেইসূত্রে বস্তির অন্যান্য পরিবারের ভাবনা, কবি মনসুর ও তার স্ত্রী রশৌনা, পত্রিকা অফিস, রেশনের দোকান, শুঁড়িখানা, চোরাকারবারের গুদাম এবং রাজনৈতিক সভা-শোভাযাত্রার বর্ণনায় কলকাতার দাঙ্গার আবহ ও ধ্বংসলীলা বাস্তবরূপ লাভ করেছে।

দাঙ্গার ভয়াবহতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মন-মানসকে স্থবির করে দিয়েছে। আত্মরক্ষার ভাবনায় মানবিকতার বাষ্পটুকুও উবে গেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে মণিমালাদের রক্ষার্থে যখন তার মামা প্রমথ সুদূর মধ্যভারত থেকে ছুটে এসে তাদেরই বাড়ির সামনে দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ হারায়, তখন মণিমালারা তার জন্য যথার্থ শোক করতেও অবসর পায় না, বরং চাদর-ঢাকা লাশ ঘরে রেখে নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনায় 'সাধারণ সুখ-দুঃখের ঘরোয়া আলাপ' (মানিক, ২০০৫ক : ২৮০) জুড়ে দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। মানসিকতার এই বিপুল পরিবর্তনকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কি না জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কি না জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়িতে সকলে একত্রে উদ্‌বেগ আতঙ্কের পলগুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে। তবু তারা আলাপ করে, অবস্থা তাদেরও নিজের তালে গড়ে-পিটে সাথে সাথে টেনে নিয়ে চলেছে বলে। (মানিক, ২০০৫ক : ২৮০)

দাঙ্গার বীভৎস বিবরণ নয়, এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মূল আলোকসম্পাত করেছেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবারের মানুষের মানসিকতার ওপর। গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থসিদ্ধির তাণ্ডবে হতচকিত, বিহ্বল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে ধ্বংসলীলায় মেতে না উঠে আত্মরক্ষার্থেই কেবল তৎপর — সে-উপলব্ধি তীব্র হয়ে উঠেছে এ কাহিনিতে। সেইসঙ্গে কেউ কেউ (যেমন— উষা, রৌশনা) বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিষোদ্‌গার করেছে কিন্তু লক্ষণীয় যে সাধারণ কোনো মানুষই হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেনি। পাড়ার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাঙতে ইয়াসিন গুণ্ডা, সুবোধ সিংহ এবং নাজের আলি একটি হোটেলে বসে মদ খেয়ে কূটবুদ্ধি এঁটেছে — তার পরদিন সকালেই গলির মুখের মন্দিরের সামনে মুসলমান বৃদ্ধা নানির মৃতদেহ রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়, একইসঙ্গে মন্দিরের লোহার কোলাপ্‌সিবল দরজায় লটকানো দেখা যায় গরুর মাথা। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোককে আহত করার এই ঘটনাদ্বয়ের মূল পরিকল্পকরা মুহূর্তের মধ্যে শুরু করে দেয় সংঘর্ষ —

> পরিকল্পনাটা যাদের তারা সত্যই তৎপর। মানুষকে চিন্তা করার সুযোগ দিলে যে চলবে না এটা তারা ভালো করেই জানে।...
> শুধু নানির রক্ত নয়, তাতে নিরীহ একটি গোরুর রক্তও মেশানো হয়েছিল দৃশ্যটায় বীভৎসতা বাড়াবার জন্য। এটাও দাঙ্গা চালু করে দেবার প্রাথমিক ঘটনাবলির অঙ্গ — (মানিক, ২০০৫ক : ৩২০-৩২২)

রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির পরিকল্পনাই নয়, তার পেছনের স্বার্থসিদ্ধির স্বরূপও উন্মোচন করেছেন। মৃত্যুর পূর্বদিনে বৃদ্ধা নানিকে অপমান করতে গিয়ে নিজেই উল্টো অপমানিত হয়েছিল দাঙ্গার পরিকল্পক একজন — সুবোধ সিংহ; অন্যদিকে অপর পরিকল্পক ইয়াসিন গুণ্ডা ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে আয়ত্ত করেছিল নানির সুন্দরী পুত্রবধূকে — উভয়ের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ঘটনাও ঔপন্যাসিক সুকৌশলে উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন।

সচেতন বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ঔপন্যাসিকের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি এই হানাহানির পেছনের রহস্য জানতেন। এ দেশকে লুটেপুটে খেয়ে যারা এদেশের চরম সর্বনাশ করেছে, সেই ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক শক্তিই যে আজ ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ বাধিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তার ইঙ্গিতও আছে এ উপন্যাসে—

> কোনো কোনো সাংঘাতিক এলাকায় ট্রামে ড্রাইভারের পাশে রাইফেলধারী ইউনিফর্ম দেখা যায়, দৃশ্যটা হাস্যকর ঠেকে নগরবাসীর কাছে। অনেক মোড়েই রাইফেল ও ইউনিফর্মের, মিলিটারি ইউনিফর্মেরও ঘাঁটি বসেছে, রাস্তা কাঁপিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে সশস্ত্র ট্রাক, নগরে তবু ছুরি-ছোরা অ্যাসিড-বোমার খুন-জখম, লুটপাট, আগুন দেওয়ার সমারোহ বেড়েই চলেছে।
>
> দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে! হায় রে তামাশা! (মানিক, ২০০৫ক : ২৯৯)

বস্তুত, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল ইন্ধনদাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তারাই ক্ষমতা ছাড়ার পূর্বে এদেশের মানুষের মধ্যে স্থায়ী বিভক্তি বা অশান্তির সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিল — সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতদ্বৈধতার অনিবার্য ফসল এই দাঙ্গা।

> ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা পেশ করে। বলা হয়, নতুন সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত দেশ পরিচালনার স্বার্থে এই পরিকল্পনার প্রতি স্বীকৃতিদাতা দলগুলোর সমন্বয়ে বড়লাটের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হবে। ৬ জুন তারিখে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগ সম্মতি দিলেও প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশ নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ সুস্পষ্ট হওয়ার পরে তারা সম্মতি প্রত্যাহার করে। ফলে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিয়েই গঠিত হয় বড়লাটের কার্যনির্বাহক সমিতি। আর এ ঘটনার প্রতিবাদেই মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের আহ্বান জানায়। মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসকেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্ধারণ করে। এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম-বিদ্বেষ যুক্ত হলে সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। (সৈয়দ, ১৯৯৮ : ৩৫১)

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং এ ভূখণ্ডে স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টির ব্রিটিশ প্রচেষ্টা দারুণভাবেই সফল হয় ধর্মীয় এই সহিংসতায়। বামপন্থি রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী মানিক এ উপন্যাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মনোভাবের সমালোচনা করে তাদের শ্রেণি-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। 'গিরিনের মতে, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ব্রিটিশ রাজশক্তির শত্রু নয়, বরং বিপক্ষ।' লেখক স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণি দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং তারাই দাঙ্গা বিরোধী সভা-শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে।

কিছু ছোটগল্পের সীমিত পরিসরেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলা হয়েছে, পটভূমি হিসেবে দাঙ্গা উপজীব্য হয়েছে তাঁর 'খতিয়ান', 'ভালবাসা', 'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে' প্রভৃতি গল্পে।

খতিয়ান গল্পগ্রন্থের নামগল্প 'খতিয়ান'-এ দাঙ্গার পটভূমিতে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, শ্রমিক সংগ্রাম, ছাটাই-ধর্মঘট ইত্যাদি এবং প্রান্তিক শ্রমিক শ্রেণির চৈতন্যোদয় এবং একশ্রেণিতে একীভূত হবার বিষয়টি উঠে এসেছে। একই কারখানায় সহকর্মী, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটে সঙ্গী হওয়া এক বন্ধুর বাড়িতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অন্য বন্ধু আশ্রয় নেয় নিতান্ত প্রাণের তাগিদে। ভাঙা চৌকির নিচে লুকিয়ে রেখে সে নিজেদের সীমিত রেশন দিয়েই বন্ধুর মুখে আহার

জুগিয়ে চলে বন্ধুত্বের টানে, মানবতার খাতিরে। বন্ধুর বউ বিরক্ত হয়, নিচু গলায় প্রতিবাদ জানায় তাদের টানাটানির সংসারে বাড়তি মুখের খাবার জোগাতে; কিন্তু নিজেদের বিপদের আশঙ্কায় তটস্থ হলেও বন্ধুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় না সে। লেখক এ প্রসঙ্গটি বিবৃত করেছেন এভাবে—

> তাকে লুকিয়ে রেখে পাড়ার প্রতিহিংসায় উন্মাদ মানুষগুলির কাছে অপরাধ করার অনুভূতি আর ধরা পড়লে শাস্তির ভয়টা স্বামীর চেয়ে তার অনেক বেশি তীব্র। আপদ বিদায় করে স্বস্তি পাবার সহজ উপায়টার কথা তবু কিন্তু একবারও তার মুখে শোনা যায় না। (মানিক, ২০০৫ : ২১০)

দুদিন পর চৌকির তলার দমবন্ধ অথচ নিরাপদ পরিবেশ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বজনের টানে বড় রাস্তার অপর পাশের বস্তিতে নিজ বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করে সে। বড় রাস্তার প্রাণঘাতী হামলা এড়াতে ঘুরপথে সাহেব পাড়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় এলাকার শান্ত, নিরুদ্বেগ আবহাওয়া বিভ্রান্ত করে তাকে। কিছুদূরে বড় রাস্তায় প্রাণঘাতী সংঘর্ষ, কোলাহল চলছে অথচ সেখানে সাহেব পাড়ার নিয়মিত জীবন ছন্দপতনহীন, এই বিপ্রতীপতা তাকে আহত করে। বস্তি এলাকার আকাশ যেখানে আগুনে লাল, বাতাস যেখানে ধোঁয়া ও মাংসপোড়া গন্ধে পূর্ণ, বস্তি এলাকার পর ইটের বাড়ির এলাকা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পাড়া পথ যেখানে জনশূন্য কিন্তু মৃতদেহ-আকীর্ণ সেখানে সাহেবপাড়ার আলোকিত 'পথটিতে যেন রাশি রাশি শান্তি ও শুচিতা ছড়ানো' (মানিক, ২০০৫ : ২১২)। সাহেব পাড়ার একটি বাড়ি থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজে ধনী-গরিবের চরম বৈপরীত্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মের জিগিরে সৃষ্ট হানাহানি শেষ হলে কর্মক্ষেত্রে দু-বন্ধুর কথোপকথনে দাঙ্গার স্রষ্টা ও ফলভোগীর পরিচয় আভাসিত —

> দেখলি তো? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।
> না তো কী ? কে মরবে তবে?
> ওনারা সব ঠিক আছেন বাহাল তবিয়তে।
> তা রইবেন না? বাহাল তবিয়তে রইবার জন্যে তো এত কাণ্ড। (মানিক, ২০০৫ : ২১২)

খানিকপর তারা দু-বন্ধুসহ চল্লিশ জন ছাটাই হয় কর্মস্থল থেকে। একমাস আগে তিনজনকে বিনা কারণে ছাঁটাই করা হলে তারা প্রতিবাদ-ধর্মঘটে মালিক পক্ষকে বাধ্য করেছিল ওই তিনজনকে কাজে ফিরিয়ে নিতে, একমাস পর একত্রে চল্লিশ জনকে কাজ থেকে বাদ দেয়া হলেও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় না — কেননা জাত-পাতের হানাহানিতে শক্তি তাদের ক্ষয় হয়েছে ব্যাপক। উপরন্তু দাঙ্গা-জনিত পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করায় সংঘবদ্ধ হতে যেমন তারা পারেনি, তেমনি প্রতিবাদও গড়ে ওঠেনি। বরং ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে তারা গ্রেফতার হয় পুলিশের হাতে। গল্পের সমাপ্তিতে বন্ধুদ্বয়ের উপলব্ধিজাত দর্শন তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় —

> বল শালা তোর কোনো জাত নেই, আমার কোনো জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব।
> আমরা গরিবের জাত। (মানিক, ২০০৫ : ২১৩)

গল্পের অন্তিমে এ সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে লেখকের মৌল উদ্দেশ্য সার্থকতা পেয়েছে। গল্পকার সূচনা থেকেই সতর্ক সচেতনতার সঙ্গে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লক্ষণীয় যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বন্ধুদ্বয়ের গল্প এটি — তাদের কোনো নাম-পরিচয় দেয়া হয় নি, তারা প্রথম থেকেই নাম-পরিচয়ের ঊর্ধ্বে দরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অথবা নাম নেই বলে কে হিন্দু, কে মুসলমান তা যেমন বোঝা যায় না, কে আশ্রয়দাতা আর কে আশ্রয়প্রার্থী অথবা কে আক্রান্ত আর কারা আক্রমণকারী তা গৌণ হয়ে যায়। বিশেষ কোনো শ্রমিকের জীবন নয়, শ্রমিক জীবন অবলম্বনে গল্পের কায়ানির্মাণে নামহীনতা তাই তাৎপর্য পেয়েছে। ধনী-গরিবের বৈপরীত্যের পাশাপাশি ধর্ম-বিদ্বেষজাত হানাহানির অসারত্ব নির্দেশ করেছেন গল্পকার গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি মানুষ নামের পরিচয়কে স্থান দিয়েছেন। গল্প-অন্তর্গত নিম্নোক্ত অংশে তার প্রমাণ মেলে —

> ধীরে ধীরে সে মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে, গ্রহ-তারার অনন্ত রহস্যের আড়ালে যিনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন তাকে শুনিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, মড়াপচা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর, কোনটা মুসলমানের? মাংসপোড়া গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারছ কোনটা হিঁদুর কোনটা মুসলমানের? (মানিক, ২০০৫ : ২১২)

এ উচ্চারণ নিরীশ্বরবাদিতার নয় বরং স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষের স্রষ্টার প্রতি গভীর অভিমান থেকে উৎসারিত। বস্তুত, মানুষ যে কেবল ধর্ম ও পোশাকের কারণে আলাদা হতে পারে না — তার সজোর প্রকাশ ঘটেছে এ উদ্ধৃতিতে। নাম ও পোশাকের ভিন্নতায় জাতি-বিভেদের অসারতাকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেন গল্পকার এ গল্পে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূল আয়োজক ধনিক শ্রেণি এবং তারা তাদের ফায়দার জন্য, দরিদ্র লোকের ভেতর হানাহানি লাগিয়ে তাদের আরও কমজোর করে শোষণচক্রকে অব্যাহত রাখতে প্রতিনিয়ত এ ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের শরণাপন্ন হচ্ছে, গল্পকারের এ দর্শনকে সামনে রেখে গল্পটি রচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতান্ত্রিক মনোভঙ্গির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে এ গল্পে।

ছোটবড় (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্প সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। 'ভালোবাসা', 'স্থানে ও স্তানে', 'স্টেশন রোড' প্রভৃতি গল্প দাঙ্গাকে উপজীব্য করে রচিত; তবে দাঙ্গার বীভৎসতা কিংবা নির্মমতা ছাপিয়ে উপদ্রুত জনপদের ব্যক্তি-মানুষের মনস্তত্ত্ব মুখ্য হয়েছে এ গল্পগুলোতে। 'ভালবাসা' গল্পের কাহিনি সরলরৈখিক। স্বামীঅন্তপ্রাণ মালতী বিয়ের একবছর না পেরোতেই স্বামীকে হারায় দাঙ্গার কারণে। তার স্বামী বিপিন দাঙ্গা থামাবার শান্তিসেনায় যোগ দিয়েছিল দাঙ্গা-উপদ্রুত জনপদকে রক্ষা করতে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি স্বার্থান্বেষী দাঙ্গাকারীর কবল থেকে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর মৃতদেহের সন্ধানে স্বামীর বন্ধু ও প্রতিবেশী সতীনাথকে সঙ্গে নিয়ে মালতী পথে বের হলে দাঙ্গাবিরোধী এক শান্তি মিছিলের মুখোমুখি হয়। মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভানোর আহ্বানরত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শান্তি শোভাযাত্রায় মালতী তার গন্তব্য খুঁজে পায়। স্বামীর মৃতদেহ সন্ধানী মালতী এ শোভাযাত্রায় একাকার হয়ে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসাকে সার্থক করে তোলে।

সরল প্লটের আধারে মালতী-হৃদয়ের মনস্তত্ত্বের জটিলতা প্রাধান্য পেয়েছে এ গল্পে। প্রথমাবধি মালতী বিপিনকে হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত। দাঙ্গা-বিপর্যস্ত জনপদে প্রতিমুহূর্তে ভালোবাসার জনকে হারানোর যে আতঙ্ক তা মালতীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে —

> মালতীর শুধু দুপুর নয়, বুকের ধুকধুকানির কখনো তার বিরাম নেই। বাড়ি ফিরলেও কি শান্তি আছে? আজকের মতো নয় নিশ্চিন্ত, কাল? কাল তো আবার যেতে হবে, ফিরতে হবে?... ঘরেই কি স্বস্তি আছে? কখন কী হয়, কখন কী হয়। এ বস্তিতে আগুন, ও বস্তিতে আগুন, এ পাড়ায় হানা, ও পাড়ায় হানা — (মানিক, ২০০৫ : ২৮৭)

একবছর আগে পোড়া গলির ওপাশের বস্তির ধ্বংসাবশেষ প্রতিমুহূর্তে মালতীকে সে দিনের দুঃসহ স্মৃতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 'ভস্মস্তূপের দিকে চোখ পড়লেই তার মনে পড়ে যায় দিনদুপুরে সেই বীভৎস কোলাহল, আগুনের রক্তিম শিখা আর মন-প্রাণ চিরে চিরে দেওয়া অবর্ণনীয় আর্তনাদ।' (মানিক, ২০০৫ : ২৮৮) এ দৃশ্য, সে দেখতে চায়নি, এ আওয়াজও সে শুনতে চায়নি — কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়ার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় সামাজিক-রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার। জগতের অপার সৌন্দর্যের সন্ধান না করে তাই মৃত্যুর অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে হয় মালতীকে। স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে মালতী আর্তনাদ করে না, শব্দ করে কাঁদে না বরং নির্বিকারভাবে বের হয়ে পড়ে বিপিনের মৃতদেহের সন্ধানে। তার এ প্রতিক্রিয়া আকস্মিক কিংবা নাটকীয় নয়। মধ্যবিত্ত এ তরুণীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাই হারাবার শঙ্কা আর নেই। জীবন ও কর্মের প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রেখে প্রাণ হাতে নিয়ে প্রায় বৎসরাধিক কাল দাঙ্গা-উপদ্রুত শহরে সাধারণ নাগরিকের বিপন্ন, বিপর্যস্ত মনস্তত্ত্বের বিবরণ চমৎকার শৈলীতে মালতী চরিত্রের মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভালবাসা' গল্পে প্রকাশ করেছেন।

লিও টলস্টয়ের একটি গল্পের[১] আদলে রচিত 'ছেলেমানুষি' গল্পেও দাঙ্গা-বিপর্যস্ত নগরের চালচিত্র ধরা পড়েছে। পাশাপাশি বাড়ির তারাপদ ও নাসিরুদ্দীনের পরিবারের সখ্য, ধর্মের বিভিন্ন বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে কন্যা গীতা ও নাসিরুদ্দীনের পুত্র হাবিবের ছেলেমানুষি দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলার সূত্র ধরে পরস্পরের জখম হওয়া এবং সে উত্তেজনা বড়দের মাঝে ছড়িয়ে গিয়ে সমগ্র পাড়ায় অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি এবং ক্রমে প্রশাসন পর্যন্ত নড়ে ওঠার ঘটনা যখন ঘটে তখন দেখা যায় চিলেকোঠার ছাদে ছেলেমেয়ে দুটি পূর্বের ঘটনা ভুলে নতুন করে শুরু করা খেলা ছেড়ে বড়দের ছেলেমানুষি দেখছে পরম কৌতূহলে।

এ গল্পে গীতা ও হাবিবের ছেলেমানুষি খেলার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় গল্পকার স্পষ্ট করেছেন। প্রথমত, আবহমান কাল ধরে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানের পাশাপাশি আন্তরিকতা ও পরম সহৃদয়তার সঙ্গে বসবাস, বন্ধনহীন মেলামেশা এবং পরস্পরের ধর্মীয় আচারের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তারাপদ ও নাসিরুদ্দীন পরিবারদ্বয়ের প্রতীকী পরিচর্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গল্পকার শুরুতেই শ্রেণিগত অবস্থানে এদের একীভূত করে বর্ণনা করেছেন —

ব্যবধান টেকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালোবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্নে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন,– রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন দেখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারে। (মানিক, ২০০৫ : ২৯৮)

এ অংশে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এ দেশীয়দের ক্ষোভের। বস্তুত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির সযত্ন পরিচর্যা ও ইন্ধনে আবহমান কাল ধরে পাশাপাশি নিরুদ্বেগে বসবাসরত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার হিংসা ও ঘৃণাজাত হানাহানির ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হয় এবং গল্পকার তারই ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করেছেন।

ইন্দিরা ও হালিমার সখ্য নিবিড় হয়ে ওঠে তাদের সন্তানদের কল্যাণে। গীতা ও হাবিব বর-বউ খেলে, গীতার জন্য নিষিদ্ধ মাংস সে হাবিবদের বাড়িতে খায়, হাবিব অঞ্জলি দেয় গীতাদের সরস্বতী পূজায় — উভয়ের বাবা-মা তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তারাপদর পিসি এবং নাসিরুদ্দীনের মা — অর্থাৎ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা স্বভাবতই রক্ষণশীল। তারা এগুলোকে বাড়াবাড়ি বলে বন্ধ করার দাবি জানায় অথচ কিছুক্ষণ পর তাদের দুজনকে দেখা যায় সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গল্প করতে। দু-সম্প্রদায়ের বৈরিতা নয়, শান্তি ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের এ পট কল্পিত নয়, একান্তই বাস্তব।

দ্বিতীয়ত, এই বাস্তবতার ভূমিকে বিদীর্ণ করে দাঙ্গা-উদ্ভূত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত-সংহত বিবরণ পাওয়া যায় এ গল্পে। শহরে দাঙ্গা শুরু হলেও এ পাড়ায় সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটি প্রকৃতই শান্তি বজায় রাখতে পেরেছে, আরোপিত আদর্শ বা ভাবোচ্ছ্বাসের জোরে নয় — সবার প্রয়োজনে। এ পাড়া হিন্দু বা মুসলমান-প্রধান নয় — বরং এ দুসম্প্রদায়ের মেশাল পাড়া। দাঙ্গা শুরু হলে দু'পক্ষই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে — তাই নেহাৎ প্রয়োজনে শান্তি বজায় রাখার কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় দু' পক্ষই সক্রিয়।

তৃতীয়ত, দাঙ্গা-প্রতিরোধে প্রশাসন-যন্ত্রের হাস্যকর ছেলেমানুষি আচরণ এ গল্পে তীব্র স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা ও হাবিবের দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলার সূত্র ধরে গোলমালের দিন বিকেলে পুলিশের লরি আসে। গোলমালের উৎস সম্পর্কে জানতে চায় তারা, কোনো গোলমাল হয়নি শুনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যায় না বরং সৈন্য ঘাঁটি বসায় গলির মোড়ে। সহায়ের বদলে শঙ্কায় পরিণত হয় পুলিশের দল এবং অচেনা আতঙ্কের আভাসে জনশূন্য হয় পাড়ার পথ-ঘাট।

চতুর্থত, দেশবিভাগের বিষয়টি খুব সামান্য তবে দার্শনিক মনোভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে এ গল্পে। গল্পকারের এ সম্পর্কিত মনোভঙ্গি শিল্পিত রূপ পেয়েছে কাহিনির বয়নে।

তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা, হালিমা বলে মুখোমুখি জানালায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব? গাছের ডালে বাসা বানাব? (মানিক, ২০০৫ : ৩০০)

হালিমার এ জিজ্ঞাসা দেশবিভাগের রাজনৈতিক পটভূমির যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যারা তাদের ভাগ্য-নির্ধারণের বিধাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে — তাদের প্রতি তীব্র শ্লেষ শব্দরূপ পেয়েছে এ অংশে। প্রকৃতপক্ষে হাবিব ও গীতার রূপকে গল্পকার হিন্দু-মুসলমান দু-সম্প্রদায়কে রূপায়িত করেছেন এবং গীতা-হাবিবের মতোই সম্প্রদায়গত হানাহানি যে ছেলেমানুষি ব্যাপার তা ব্যক্ত করেছেন এ গল্পে।

'স্থানে ও স্তানে' গল্পের নামকরণের মাধ্যমেই দু-সম্প্রদায়ের বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকাবাসী নরহরি চাকরি স্থায়ীকরণের প্রয়োজনে কলকাতা থেকে স্ত্রীকে আনতে যায় নিজ বাসস্থানে। ঢাকার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতে পারে না — আবার কলকাতা নিবাসী শ্বশুরকুলকে সে বিশ্বাস করাতে পারে না তার প্রয়োজনীয়তা। শ্বশুর ও শ্যালকদের ডিঙিয়ে স্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারলেও তার মতের অনুকূলে আনতে পারে না স্ত্রীকে। কলকাতা যখন মুসলমানদের মৃত্যুপুরী, তখন ঢাকাও হবে হিন্দুদের নিপীড়নস্থল — সে ধারণা থেকে কিছুতেই বের হয়ে আসতে পারে না নরহরির শ্বশুরকুল। বরং সামান্য বিচ্ছিন্ন আলাপেই নরহরির বিবমিষা জাগে তাদের নৃশংসতা ও অবোধ্যতার জন্য। উড়িষ্যার লোকেরা বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে এ সংবাদে উদ্বেলিত হয়ে নরহরির মেজো শালা শ্যামল ও তার সঙ্গীরা এক উড়িয়া চাকর ও মোড়ের মুড়িমুড়কির দোকানদার অর্জুনকে যখন মৃতপ্রায় করে এবং ঝি ও অর্জুনের বউকে ধরেও ছেড়ে দিয়ে ভদ্রতার বড়াই করে তখন নরহরির তা অসহ্য বোধ হয়। স্টেশন থেকে আসার সময় যখন সে নিঃসঙ্গ পথচারীকে অনেকগুলো ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককর্তৃক নিহত হবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তখন হিংস্র আবহাওয়ায় তার দম আটকে আসে। বস্তুত এ গল্পে দু-দেশের দু-সম্প্রদায়ের মানুষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণার বাস্তব চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

গল্পের নামকরণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ — 'স্থান' সম্ভবত হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারত এবং 'স্তান' বলতে পাকিস্তানকে বোঝানো হয়েছে — এ সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব অসঙ্গত বোধ হবে না। গল্পের মুখ্যচরিত্র নরহরির ঘরবাড়ি, কর্মস্থল পূর্ববাংলায়- ঢাকায়। কলকাতার তুলনায় ঢাকার জীবন শান্ত, নিরুপদ্রব; আশঙ্কা সেখানেও আছে, তবে তা মনে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নয়। অবিশ্বাস সেখানেও আছে — আর আছে বলেই নরহরির কলকাতা যাত্রাকে অনেকে পলায়ন বলে বিদ্রূপ করে। গল্পের প্রথমাংশেই গল্পকার দাঙ্গার নারকীয়তায় বিপর্যস্ত কলকাতার বিপ্রতীপে পূর্ববাংলার উদার সহাবস্থানের ইঙ্গিত করেছেন কলকাতাগামী স্টিমারের বর্ণনাচ্ছলে —

> স্টিমারে অসম্ভব ভিড়। পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ স্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গোরুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি-শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল। নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখেমুখে নড়াচড়ায় কথা বলার ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মীমাংসাহীন অচেতন আদান-প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয়, বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনায় যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে। (মানিক, ২০০৫ : ৩০৭)

দুই বাংলার মানুষের মানসিকতার বৈপরীত্যকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে গল্পের অন্তিমে এসে। অবিশ্বাসের দোলাচল ভাঙতে নরহরি কলকাতার তথাকথিত নিরাপদ (হিন্দুদের জন্য) আশ্রয় থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ঢাকা নিয়ে আসতে চায়। পূর্ববাংলার লোকেদের মনে এ প্রতীতি জন্মাতে চায় সে পালাবে না। তাতে তার চাকরি স্থায়ী হবে সত্য, তবে বোধহয় তার চেয়ে বেশি সত্য, পূর্ববাংলা তার নিজের দেশ — স্বদেশে স্থায়ী হয়ে স্বদেশবাসীর আস্থা অর্জন তার অভীষ্ট। যদিও শ্বশুর-শ্যালকদের বোঝাতে সে ব্যবহার করে চাকরি চলে যাবার মোক্ষমযুক্তি —

> — কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ও দেশের লোক হয়ে? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে? (মানিক, ২০০৫ : ৩১০)

এতেও যখন কাজ হয় না বরং চাকরি ছেড়ে কলকাতায় থাকার উপদেশ দেয়া হয়, কলকাতা নিবাসী সাম্প্রদায়িক হিংসায় বিক্ষুব্ধ শ্যালকের উদ্দেশে সে সক্ষোভে উচ্চারণ করে—

> আমরা যদি ডুমড্ হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের বড়ো শত্রু। (মানিক, ২০০৫ : ৩১১)

সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ উচ্চারণ অত্যন্ত সাহসী। উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উচ্চারিত এ মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে বিভাজিত করেছিলেন উপনিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে বা স্বেচ্ছাচারিতায়। প্রবল আপত্তি ও প্রতিরোধের তোপে ছয় বছরের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত উবে যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টে র‍্যাডক্লিফের কলমের এক আঁচড়ে স্থায়ীভাবে বাংলার যে বিভাজন তা কিন্তু আকস্মিক নয় বরং পরিকল্পিত। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলস্বরূপ এ বিভাজন যৌক্তিকতা পায় এবং এ বিভাজনের জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয় বাঙালি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে স্থিত হওয়ার বাসনাকে। বলা হয়ে থাকে শিক্ষা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানরা চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগামী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে পৃথক হতে চেয়েছে এবং তাদের চাহিদার কারণেই বাংলা বিভক্ত হয়েছে। অথচ সত্যিটা ছিল ভিন্ন এবং বর্তমানে ক্রমশ তা প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৯০ সালে লন্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত একটি ডক্টরাল থিসিস (*Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge, 1994)-এ বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে, ১৯৪৭-এর বাংলা বিভাগের পেছনে সক্রিয় ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা ধর্মগতভাবে হিন্দু (উচ্চবর্ণের) এবং সমগ্র বাংলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ — তারা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সুপরিকল্পিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা বিভাগকে অপরিহার্য

করেছিল। এ গবেষণায় দেখানো হয়, ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে বাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত সম্প্রদায়গত রোয়েদাদে মুসলমানদের দেওয়া হয় আইনসভার মোট আসনের শতকরা ৪৭.৮ ভাগ, অনুন্নত শ্রেণি, মুসলিম মহিলা ও অন্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে হিন্দুদের জন্য দেয়া হয় মোট আসনের মাত্র ২৮ ভাগ। সম্প্রদায়গত এই রোয়েদাদ আইন সভায় বাঙালি ভদ্রলোক (হিন্দু)দের দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করে। 'অধস্তন' মুসলমানদের শাসনকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি বাংলা বিভাগ এবং পৃথক হিন্দু আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে এগিয়ে নেয়। বাংলাকে ভাগ করার জন্য ভদ্রলোকেরা [ষাটের দশকে জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড 'ভদ্রলোক' কথাটি ব্যবহার করেন 'পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোক' হিসেবে এবং তাদের গণ্য করেন 'ওয়েবারিয়ান (Weberian) গ্রুপের লোকদের মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মতো। ঐ কথাটিকে অন্য একজন ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন 'উচ্চ বর্ণের ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুবিধাভোগী বাঙালি সমাজের অভিজাত শ্রেণীর' লোক হিসেবে। (জয়া, ২০১৪ : ৩)] কীভাবে সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করে এবং এই প্রয়াস কীভাবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্রমবর্ধমান ইন্ধন যুগিয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণা-পত্রে।

গবেষক ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন—

> হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাঙলা আবার ভাগ হয়। কিন্তু এ সময় প্রায় কারও কণ্ঠেই প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল না, বরং দ্বিতীয় বার বাঙলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল — যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা। এই আন্দোলনে বাঙালি সমাজের সেই শ্রেণির লোকেরাই নেতৃত্ব দেয়, যারা বাঙলার প্রথম বিভাগের সময় থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিল, যাদের পরিচিতি ছিল তথাকথিত ভদ্রলোক বা 'সম্মানিত লোক'। মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে ভদ্রলোক রাজনীতি তার সূচনা বিন্দুতে এসে সমাপ্ত হল — তারা জাতীয়তাবাদী বিষয়সূচি থেকে সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ বিষয়ের দিকে সরে গেল। (জয়া, ২০১৪ : ১)

প্রকৃতঅর্থে ইতিহাসের পুনমূর্ল্যায়নে মুদ্রার ওপিঠটা আজ উন্মোচিত হয়েছে। তবে দীর্ঘকাল দাঙ্গা ও দেশবিভাগের দায়ভার বয়ে বেড়াতে হয়েছে মুসলমানদের। এ সম্পর্কে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসানের মন্তব্য তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'আমার মাস্টার মশাই : জয়নুল আবেদিন' — থেকে উদ্ধৃত করা হলো—

> এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বাধবে, এ বিষয়ে বহু আগে থেকেই আমাদের ভেতর একজন নিশ্চিত ঘ্রাণ পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস ভাই।...
> তিনি বলেছিলেন, 'দাঙ্গা বাধাবে অপরপক্ষ, কিন্তু দোষ হবে আমাদের– দেখে নিয়ো।' হলোও তাই। ...
> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে ঘোষণা করা হয়েছিল কেবল পাকিস্তানবিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য, দাঙ্গা বাধানোর জন্য নয়। কলকাতার মুসলমানদের সামনে গড়ের মাঠে জনসভায়

সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন, সবাই দলে দলে যোগদান করবে — এই ছিল প্রত্যাশা। দলে দলে যোগদান করেছিলাম। দলে দলে সবাই গিয়েছিল সভায়। লাঠিসোটা নিয়ে যায়নি কেউ, বরং কলকাতার চিরাচরিত মিছিলের রীতি অনুযায়ী ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড-বাদ্য ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিল। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। আজও চোখ বুজলে পরিষ্কার দেখতে পাই সে দৃশ্য। হিন্দু মহাসভার দীর্ঘদিনের মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রচারের মাহাত্ম্যকে এ ব্যাপারে প্রশংসা না করে পারছি না। কেননা, দাঙ্গা লেগে যেতে দেরি হলো না। বোধহয় ১৭ আগস্ট সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস সদস্যদের সামনে ওই যুক্তিই তুলে ধরেছিলেন যে 'দাঙ্গা করার মতলব থাকলে লোকে লাঠিসোটা, ঢাল, তলোয়ার (তখন এসএলআর বা এসএমজি চালু হয়নি) নিয়েই আসত, বোকার মতো মার খাওয়ার জন্য ব্যান্ড বা ঢাকঢোল নিয়ে নাচতে নাচতে আসত না। তিন দিন হিন্দু-অধ্যুষিত পাড়ার মুসলমান বাসিন্দাদের ওপর যে পাইকারি ও অরগানাইজড আক্রমণ চালানো হয়েছিল, এরও আমি প্রত্যক্ষদর্শী। অবশ্য ওই কয় দিন মুসলমান পাড়ার হিন্দুরাও যে আক্রান্ত হয়নি, তা অস্বীকার করব না। তবু প্রথম দিনে মুসলমানেরা কলকাতার আদি হিন্দুর মিষ্টির দোকান যে মহানন্দে লুট করে মিষ্টি নিয়ে কাড়াকাড়ি-হুড়োহুড়ি করেছে, এ দৃশ্যও আমার নিজের দেখা। দাঙ্গার সংজ্ঞা তখন অবধি কলকাতার আদি মুসলমানদের কাছে কেবল অন্য সম্প্রদায়ের জিনিস লুটপাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব ১৬ আগস্টের সন্ধ্যায় যেই রটে গেল হিন্দু-মুসলমান লড়াই বেধে গেছে, অমনি প্রথমেই শুরু হলো হিন্দু মালিকদের মিষ্টির দোকানের কাচের শোকেস ভেঙে খাওয়ার ধুম। আর তারপর কাপড়ের দোকানে লুটের পালা। এরা সবাই অশিক্ষিত দীন দরিদ্র কলকাতার বস্তির মুসলমান। দুই দিন পর তারা অবশ্য বুঝতে পারল, কাপড়ে কতটা রক্তের রং লেগেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আদিম আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কলকাতা শহর দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। (কামরুল, ২০১০ : ৮৯-৯০)

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রমাণসহ আজ যা উপস্থাপন করেছে, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *ছোটবড়* গ্রন্থভুক্ত 'স্থানে ও স্তানে' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে সত্যের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। একমাত্র অসাধারণ প্রতিভার জোরেই এধরনের কালোত্তীর্ণ মানসের পরিস্ফুটন সম্ভব।

'স্টেশন রোড' গল্পে দেখানো হয় দাঙ্গা উপদ্রুত শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে হিন্দু-মুসলমান একীভূত হয়েছে পদ্মলোচনের গানের নৈশ আসরে। প্রশাসনের আপত্তিতে তারা শহরের সীমানায় গানের আসর বসাতে পারে না কেননা তাতে লঙ্ঘিত হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা কিন্তু রেললাইনের অপর পাড়ে 'একশো চুয়াল্লিশ আর সাঁঝবাতি আইন এলাকার একশো গজ দূরে (মানিক, ২০০৫ : ৩২০) গ্রামীণ এলাকায় তারা গানের আসরে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। নিতাই, মনোহর, সামসুদ্দীন, নুরুল ধর্ম ও জাতপাতের সীমানা তুলে দিয়ে প্রাণের তাগিদে গানের আসরে স্থান করে নেয় নিজেদের। এ গল্পে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বিপ্রতীপে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের এক সুষম চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পকার এ সত্যকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন যে, শাহরিক রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান পৃথক পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার নিমিত্তে দাঙ্গায় সক্রিয়। অন্যদিকে সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষ গ্রামীণ বা বাঙালি লোকসংস্কৃতির সামিয়ানার নিচে একত্র প্রাণের টানে, ধর্ম সেখানে তুচ্ছ।

বাঙালি জীবনে দেশভাগ এবং তৎপূর্ব ও পরবর্তী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বা দাঙ্গা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে। কেবল দাঙ্গাকে বিষয় করে রচিত বাংলা

উপন্যাস সংখ্যায় নগণ্য তবে দাঙ্গার উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৫), আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), প্রফুল্ল রায়ের *কেয়াপাতার নৌকা* (১ম পর্ব ১৩৭৬, ২য় পর্ব ১৩৭৭), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১ম খণ্ড ১৯৭১, ২য় খণ্ড ১৯৭২) উপন্যাসে। হিন্দি ভাষায় ভীষ্ম সাহানির *তমস* (১৯৭৫) এবং উর্দু ভাষায় লেখা কৃষণ চন্দরের *গাদ্দার* উপন্যাসেও এ উপমহাদেশে '৪৬-'৪৭ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতার নারকীয় ঘটনাসমূহ শিল্পরূপ পেয়েছে। ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরেও দাঙ্গার বীভৎসতা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এবং পাঠকদের শিহরিত করেছে। বাংলা, হিন্দি, উর্দু ভাষায় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দাঙ্গার বীভৎসতা, মানুষের অন্তর্গূঢ় বেদনা নিরাবেগ তথ্য-ভাষ্যে ঠাঁই পেয়েছে। এ বাংলার ইসহাক চাখারীর 'রায়ট', আবু ইসহাকের 'বনমানুষ', হাসান হাফিজুর রহমানের 'আরো দুটি মৃত্যু', সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ছুরি', হাসান আজিজুল হকের 'পরবাসী' প্রভৃতি গল্পে যেমন দাঙ্গার বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি পশ্চিম বাংলার রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', সমরেশ বসুর 'আদাব', সলিল চৌধুরীর 'ড্রেসিং টেবিল' প্রভৃতি গল্পেও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনমানুষের দুঃখগাথা শব্দরূপ পেয়েছে। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি ভাষার ছোটগল্পেও দাঙ্গার নির্মমতা শিল্পরূপ পেয়েছে। হিন্দি ভাষায় যশপাল-এর 'খোদা আর ঈশ্বরের লড়াই', পাঞ্জাবি ভাষায় ভীষ্ম সাহানির 'অমৃতসর এসে গিয়েছে', কুলবন্ত সিং বির্কের 'আগাছা'; উর্দু ভাষায় সাদাত হাসান মান্টোর 'তোবাটেক সিং', খাজা আহমদ আব্বাসের 'প্রতিশোধ', কৃষণ চন্দরের 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত তালিকা আমাদের আশ্বস্ত করে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশেষত '৪৬ -' ৪৭-এর দাঙ্গার অমানবিকতা উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানুষের মতো সাহিত্যিকদের মর্মমূলে তীব্র বেদনার সৃষ্টি করেছিল এবং সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ও অন্যান্য উপমহাদেশীয় ভাষার গল্প-উপন্যাসের বিষয় হিসেবে দাঙ্গা উপজীব্য হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত দাঙ্গা-বিষয়ক উপন্যাস ও ছোটগল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। প্রথমত, *স্বাধীনতার স্বাদ* বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উপন্যাস — যার পটভূমি ও অবলম্বিত বিষয় '৪৬-'৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অন্যান্য বাংলা উপন্যাসে কেবল দাঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায় বা মূল ঘটনার আবর্তনে দাঙ্গা-উদ্ভূত পরিবেশের কিছু বিবরণ বা উৎকণ্ঠা-আশঙ্কায় নিমজ্জিত মানুষের মনোভূমির সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে তা ছড়িয়ে পড়ে না বা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেও অবস্থান করে না। পাঞ্জাবি ও উর্দু ভাষায় রচিত *তমস* ও *গাদ্দার* উপন্যাস দাঙ্গা-কেন্দ্রিক কিন্তু তাতে দাঙ্গার বীভৎসতা, হত্যা-পাশবিকতার রূঢ় মর্মস্পর্শী বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসে দাঙ্গার বিবরণ কেবল নয় গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় এর কার্যকারণ, দাঙ্গা-উপদ্রুত জনমানুষের জটিল মনস্তত্ত্বসমেত বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া দাঙ্গা-বিরোধী শান্তিকামী মানুষের শান্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের ইতিহাস এ উপন্যাসে যেমনটা পাওয়া যায় তা অন্যভাষার সাহিত্যেও দুর্লভ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উচ্চে মানবতাকে কেবল নয়, শ্রেণি-দ্বন্দ্বকেও স্থান দিয়েছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মানদণ্ডে দাঙ্গাকে স্থাপন করে সুচারু বিশ্লেষণ এবং অমোঘ যুক্তিগ্রাহ্যতায় পাঠককে এ বোধে জারিত করেছেন যে, নিম্নবর্গীয় মানুষেরাই ধর্মীয়

হানাহানির বা সংহিসতার শিকারে পরিণত হয় অথচ উচ্চবর্গীয়রা যারা এ গণ্ডগোলের হোতা তারা নিজেরা থাকে নিরাপদ দূরত্বে। বস্তুত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবিকতা বোধের প্রখরতায় তাঁর রচনা অন্যান্য দাঙ্গা-বিষয়ক রচনা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে মানিক যে দৃষ্টিকোণে রাজনীতি এবং যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সমকালীন বাংলার সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন তা অন্য সাহিত্যিকদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। অধিকাংশ সাহিত্যিক সংবেদনশীল শিল্পীমনে মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে দাঙ্গা-বিরোধী গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। মানিক এই মানবতাবোধের সঙ্গে যোগ করেছেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দেখিয়েছেন শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে শ্রেণি-দ্বন্দ্বই মুখ্য হওয়া উচিত, ধর্মীয় নয় অর্থাৎ ধর্মীয় কার্যকারণের বিপ্রতীপে শ্রেণিগত দ্বন্দ্বকে সক্রিয় করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, সমাজ বদলের আহ্বান করেছেন তিনি।

সামাজিক আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া দুঃসাহসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত পিস কমিটিতে যোগ দিয়েছেন। সাংসারিক দায়বদ্ধতা, চরম দারিদ্র্য, দুরারোগ্য ব্যাধি এসব তুচ্ছ করে মানিক কেবল দুঃসাহস সম্বল করে উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখেছেন, একাধিকবার প্রাণ বিপন্ন হলেও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে গেছেন নিরলসভাবে। তাঁর ডায়েরিতে বিস্তৃতভাবে জুড়ে থাকে তৎকালে সংঘটিত কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের পরিপ্রেক্ষিতে একজন অশান্ত শিল্পীর উদ্বেগ আর উত্তেজনার বিস্তৃত ইতিহাস এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুনাফা অর্জনের ব্যঙ্গচিত্র।

> ...দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে একরকম জানাই ছিল, তবু মনে হল — কি আপশোষ! কি আপশোষ!
> রাত প্রায় ১০ টায় পার্টির দুটি ছেলে এল। Peace Committee গঠনের চেষ্টা হচ্ছে — সকালে যেতে হবে।... (১৬ অগাস্ট, ১৯৪৬ শুক্রবার)
> সকালে Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এল না, একটু আশ্চর্য্য হলাম।...
> বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে বার হলাম — যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি — মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার– কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে তারপর এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা — হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট — মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে! 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল। (১৭ অগাস্ট, ১৯৪৬ শনিবার)
> মিটমাটির চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকেলের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি।... ক'জনকে বক্তৃতা করতে দেওয়ায় মারটা খেলাম না। K.P. Roy Lane দিয়ে বাঁক পর্য্যন্ত এসেছি — লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকে দিল — ফের আমায় ভিড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি! — নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয় মার খেতাম। 'শালা কম্যুনিস্ট!' 'মুসলমানের দালাল।' রব উঠেছিল চারিদিকে।.. (১৮ অগাস্ট, ১৯৪৬ রবিবার)
>
> (যুগান্তর, ১৯৯০ : ৮৬-৮৯)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান কারো পক্ষাবলম্বন করেননি, কারও দোষ-ত্রুটির কথাও বলেন নি; তিনি মানুষের কথা বলেছেন, মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বিশ্লিষ্ট করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে তাঁর কথাসাহিত্যের অবলম্বন করেছেন সযত্ন পরিচর্যায়। ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়কে সাহিত্যের আধারে ঠাঁই দিয়ে তিনি মানবতার অবমাননার বহু কৌণিক ও মাত্রিকতাময় চালচিত্র ধারণ করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতামুক্ত শ্রেণিহীন এক নির্মল সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়বস্তু রাজনৈতিক হলেও তাঁর রচনা কেবল শ্লোগানধর্মী হয়ে থাকেনি বরং রূপ নির্মাণে সাফল্য অর্জন করায় মানিক-কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে কালোত্তীর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

টীকা

১. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা-এর 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র অন্তর্গত শহীদুল আলম সম্পাদিত, জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকাশিত *সেরা কিশোর গল্প : লিও টলস্টয়* গ্রন্থভুক্ত 'শিশুর সরলতা' (রুশ থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত গল্পটির নাম : 'Children may be wisen than their elder' গল্পটির ছায়া পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছেলেমানুষি' গল্পে।

গ্রন্থপঞ্জি

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮৯)। *উত্তাল চল্লিশ– অসমাপ্ত বিপ্লব*। পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা।

আখতার হুসেন [সম্পা.] (১৯৯১)। *সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

কামরুল হাসান (২০১০)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, সৈয়দ আজিজুল হক [সম্পা.]। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০১৪)। *বাঙলা ভাগ হল*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নিতাই বসু (১৯৮৬)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

বিপ্লব মাজী [সম্পা.] (২০১২)। *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল, ঢাকা।

ভূইয়া ইকবাল (সম্পা.) (২০০১)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫)। *মানিক রচনাবলি* ষষ্ঠ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫ক)। *মানিক রচনাবলি* সপ্তম খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।

যুগান্তর চক্রবর্তী [সম্পা.] (১৯৯০)। *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শিখা ঘোষ (১৯৯০)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক (১৯৯৮)। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ [সম্পা.] (২০০৮)। *উত্তরাধিকার*। ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সোমেন চন্দ (২০১৩)। *সোমেন চন্দ রচনাবলি*, বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.]। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।